কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ০৯-০১-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে ধান ও কৃষি নিয়ে ভাবতে হবে

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ধানের উৎপাদন কতটা টেকসই হবে, তা বলা মুশকিল। শুধু জিন প্রকৌশল আর গতানুগতিক যান্ত্রিকায়ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে চলছে না। ডিজিটাল-প্রযুক্তির নতুন থেকে নতুনতর সুবিধা কাজে লাগাতে হবে

ভাতের অভাব বলতে যা বোঝায়, তা কিছুটা হলেও মিটেছে। পাশাপাশি মাছ-মাংস-ডিমের বেলায়ও আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করছি। দুধে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও উৎপাদনের হার সন্তোষজনক। ফলমূল-শাক-সবজিতেও বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে কৃষিতে এত সব অর্জন আর কৃষকের অর্থনৈতিক লাভালাভের বিষয় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বিতর্ক আছে। আমি সে বিষয়ে কিছু বলছি না। আমার আলোচনার বিষয় ধান বা কৃষির এই যে অর্জন, তা কতখানি টেকসই এবং আমাদের আগামীর চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট কি না।

আমাদের দেশটা ছোট। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ কম। তদুপরি আবাদি জমি প্রতিনিয়ত কমছে। আছে জনসংখ্যার ভার। স্বাধীনতার বছরে আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটির কিছু বেশি। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। অনুমিত হিসাবে ২০৩০ ও ২০৫০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৮ কোটি ৬০ লাখ ও ২১ কোটি ৫৪ লাখ। স্বাধীনতার ১০০ বছরের মাথায় এই জনসংখ্যা হবে ২৪ কোটি ৩০ লাখ। এখনই আমাদের এই জনসংখ্যার খাদ্য জোগাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতের বর্ধিত জনসংখ্যাকেও তো খাওয়াতে হবে। সেটা সম্ভব কিভাবে? তাই ধানের উৎপাদন শুধু বাড়ালেই চলবে না। সেই বৃদ্ধিকে টেকসইও করতে হবে। এসব কিছু মাথায় নিয়েই ব্রির বিজ্ঞানীরা Vision 2050 and Beyond শিরোনামে একটি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছেন কয়েক বছর আগে। সেখানে ধান-চাল উৎপাদনের হিসাবটাই মুখ্য। তাঁদের হিসাবে, বছরে একজনের চালের দরকার ১৪৮ কেজি। সাম্প্রতিককালে মাথাপিছু চাল খাওয়ার ট্রেন্ড কমতির দিকে। পরিমাণটা ০.৭ শতাংশ। তাহলে ২০৪০ সাল নাগাদ জনপ্রতি চাল দরকার পড়বে ১৩৩ কেজি। এর পরে হয়তো আরো কমবে। যা হোক মানুষের ভাতের দাবির বাইরে আরো অনেক কাজে প্রায় ২৫ শতাংশ চালের দরকার পড়ে। যেমন–বীজ, পশুখাবার, মাঠ থেকে ঘরে তোলার ফাঁকে কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া, ঘরে তোলার পরেও নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ২০১৪ সালের হিসাব অনুসারে সারা বছরে চালের দরকার ছিল ৩২.৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এখানে ভাতের জন্য ২৪.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ৮.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে লাগে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সে বছর মোট চাল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৪.৮৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থাৎ প্রায় ২.০ মিলিয়ন মেট্রিক টনের কিছু বেশি হাতে ছিল। এই পরিমাণ বা তার কিছু বেশি প্রতিবছর হাতে থাকতেই হবে। কারণ আপদবিপদ কখন কিভাবে আসে বলা যায় না। এবং উৎপাদন পরিকল্পনাটা এমনই হতে হবে, যেন প্রতিবছর বাড়তি ২২ লাখ নতুন মুখের খাবারের জোগান মিটিয়েও যেন দুই মিলিয়ন মেট্রিক টন বেশি থাকে। এই হিসাবে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার হতে হবে বছরে কমবেশি ০.৩৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সত্যি কথা বলতে কি, এ হারটা ২০৫০ সাল পর্যন্ত বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে উৎপাদিত চালের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সেখানে খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ দরকার হবে ৪৪.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বাকিটা জরুরি প্রয়োজনে হাতে থাকবে। আর এটা কিভাবে সম্ভব?

আগেই বলেছি, জনভারে জর্জরিত দেশ এবং জমি কমছে। সঙ্গে আরো অনেক সমস্যা। যেমন–স্বাভাবিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধানের ফলন সিলিং (Yield ceiling) ভাঙতে না পারা, উদ্ভাবিত নতুন জাত কৃষকের দোরগোড়ায় সময়মতো পৌঁছে দিতে না পারা, তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গবেষণাগারের প্রায়োগিক জ্ঞান ঠিকমতো কাজে না লাগাতে পারা, ফলন পার্থক্য নিয়ে চাষিদের উদাসীনতা, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে ঝরা-খরা-বান-বালাইয়ের উৎপাত বৃদ্ধি। এ ছাড়া আছে পানির সংকট, মাটির উর্বরতা শক্তি ক্ষয়ে যাওয়া, শ্রমিকের সংকট, কৃষিবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি, কৃষি যান্ত্রিকায়নে সমস্যা, বিশ্ববাজারে সারের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ইত্যাদি।

ধানবিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, যদি ধানের জমি ০.৪ শতাংশ হারে কমতে থাকে এবং চালের হিসাবে জাতীয় গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩.১৭ টনের জায়গায় স্থির থাকে, তাহলে ২০৫০ সালে চালের ঘাটতি হবে ১৬.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ফলাফল ক্রনিক খাদ্যসংকটের ইঙ্গিত দেয়। এ পরিস্থিতিতে যাতে না পড়তে হয়, এ জন্য ব্রির প্রথম চিন্তা হলো ধানের জেনেটিক গেইন (Genetic gain) বাড়ানো। দুইভাবে তা করা যেতে পারে। এক. ধানের প্রচলিত ফলন প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেলা, যাতে হেক্টরে প্রতিদিন ন্যূনতম মৌসুমভেদে গড়ে ৬০ কেজি ফলন (ধান) ঘরে তোলা যায়। অর্থাৎ জীবনকাল ১০০ দিন হলে হেক্টরপ্রতি ছয় টন এবং ১৪৫ দিন হলে হেক্টরপ্রতি ৮.৫ টন ধান যেন পাওয়া যায়। এ জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জাত উদ্ভাবন করতে হবে। যতটা সম্ভব জাতগুলো জৈব-অজৈব অভিঘাত সহনশীল হতে হবে। সার ও পানি সাশ্রয়ী জাত হলে ভালো হয়। দুই. ভালো জাতের পাশাপাশি নির্ধারিত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, যাতে গবেষক ও কৃষকের মধ্যের যে ফলন পার্থক্য, তা কমিয়ে ফেলা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো জাতের ফলন-সম্ভাবনা ভালো, বৈরী পরিবেশও তেমন পায়নি, অথচ ফলন তেমন ভালো হয়নি। এটা কেবল যথাযথ পরিচর্যার অভাবে হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জন্য জমি তৈরি, বীজ সংগ্রহ, বীজতলা থেকে ধান ফসলের জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন পরিচর্যা করা দরকার, তেমনটিই করতে হবে। তাহলে জেনেটিক সম্ভাবনার (পটেনশিয়ালিটির) ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশই ঘরে তোলা সম্ভব।

কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাত নির্বাচন। আরেকটা বিষয় হলো কোনো জাতই চাষিদের মাঠে পাঁচ থেকে সাত বছরের বেশি রাখা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নতুন গুণে গুণান্বিত জাত দিয়ে অবশ্যই আগের জাতটিকে (যত ভালোই করুক) প্রতিস্থাপন করতে হবে। তাহলে একই ধরনের রোগবালাই-পোকামাকড় গেড়ে বসতে পারবে না। মাটির স্বাস্থ্য যাতে সব সময়ের জন্য ভালো থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আরো কিছু বিষয় ভাবার দরকার আছে। Rice vision 2050 and beyond-এর বেলায় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। আর ২০৩০ সালের সহস্রাব্দ লক্ষ্য পূরণের বেলায় উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছে। ব্রির ক্ষেত্রে বিষয়টা হলো ধানের Productivity দ্বিগুণ করতে হবে। দ্বিগুণ করা মানে হেক্টরপ্রতি পাঁচ টন ফলনের জায়গা সরাসরি ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ টন করতে হবে এমন নয়। সেটা এই স্বল্প সময়ে সম্ভব নয়। এ জন্য ব্রি বিজ্ঞানীদের বেশ কিছু সুপারিশ আছে, সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলি। যেমন–হেক্টরপ্রতি ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি যান্ত্রিকায়নের মাধ্যমে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, কৃষিবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনার প্রচলন, সাশ্রয়ী মূল্যে উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা, অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসল যথাসময়ে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি, পুষ্টিসমৃদ্ধ ধানের আবাদ বৃদ্ধি, আবাদি কার্যক্রম ঝুঁকিবিহীন করা। এখানে ক্ষেত্রবিশেষে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হয়েছে। কৃষি বাজার ব্যবস্থায় (উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্য) তদারকির তাগিদে কৃষি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

এত কিছুর পরেও ধানের উৎপাদন কতটা টেকসই হবে, তা বলা মুশকিল। শুধু জিন প্রকৌশল আর গতানুগতিক যান্ত্রিকায়ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে চলছে না। ডিজিটাল-প্রযুক্তির নতুন থেকে নতুনতর সুবিধা কাজে লাগাতে হবে। ধানকে টেকসই করতে হলে আনুষঙ্গিক কৃষি কম্পোনেন্ট বা সেক্টরগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে শামিল হতে হবে। এ জন্য ইন্টারনেট অব থিংকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বৃহত্তর তথ্যভাণ্ডার, ব্লকচেইন, রোবটিকসসহ সব সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। মাঠ, নেট হাউস-গ্রিনহাউস এবং ঘরের কোণে প্রিসিশন কৃষির প্রয়োগ নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে হবে। শুধু ধান বা ফল বা ফসল নয়। এগুলোর সঙ্গে গবাদি পশু, মৎস্য, বন ও পরিবেশের সমন্বয় ঘটিয়ে সামগ্রিক কৃষি নিয়ে এগোতে হবে। আমাদের আবহাওয়া প্রায় সব ধরনের কৃষির জন্য অনুকূল। তাই শুধু ধান ফলিয়ে ভাতের বেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলাম আর বাইরে থেকে তেল ও ডাল আমদানি করলাম, এর কোনো মানে হয় না। আমাদের জমিকে স্থান-কাল ভেদে সব ধরনের কৃষির (ফল-ফসল এবং প্রাণীনির্ভর) জন্য আনুপাতিক হারে ভাগ করে নিতে হবে।

প্রথম শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয় ১৭৮৪ সালে স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের শুরু ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কার দিয়ে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের শুরু ১৯৪৫ সালের কাছাকাছি প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার (Electronic Numerical Integrator and Computer) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। আর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের শুরু ২০১১ সালে। প্রথম থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে উত্তরণের জন্য সময় লেগেছিল গড়ে ৭৫ বছর করে। কিন্তু হাল আমলের ডিজিটাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো প্রযুক্তিগুলো কি আমাদের এত সময় দেবে? নিশ্চয়ই না। হয়তো অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শোনা যাবে পঞ্চম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। তাই আমাদের সেভাবেই এগোতে হবে। আমাদের কৃষিব্যবস্থাকে সেভাবে এগিয়ে নিতে এখনই উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরিতে মনোযোগ দিতে হবে। আর এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন